সংবাদ

2 AUG 2017

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা : বিবেচ্য অনুষঙ্গ

শরীফুল্লাহ মুক্তি

একটি সুন্দর সমৃদ্ধ আগামী পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য দরকার প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর সুস্থ সুন্দর শিশু। ওরাই একদিন বড় হয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে এ পৃথিবীকে। মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশের ধারা ও শান্তিনির্ভর করছে আজকের শিশুর ওপর। শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জন্মগত মৌলিক অধিকার। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর। বাংলাদেশের সংবিধানসহ আন্তর্জাতিক সনদসমূহেও এ বিষয়টি স্বীকৃত। শিক্ষা সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৭ নং অনুচ্ছেদে সবার জন্য একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এবং সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে আইন প্রণয়ন করে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি থেকে আংশিকভাবে এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি থেকে এ আইন পুরোপুরি কার্যকর করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও মানসম্মত করার লক্ষ্যে বিগত দশকসমূহে সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলোর মধ্যে ২০০৩ সালের পৃথক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা, শিশুদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার ব্যবস্থা, দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে শিশুদের জন্য সরকার ২০০০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও ২০০২ সাল থেকে শিক্ষার বিষয়ে উপবৃত্তি কর্মসূচি কার্যক্রম, নারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% কোটা প্রবর্তন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অন্যতম।

রাষ্ট্র সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে আধুনিক, বৈষম্যহীন ও অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখবে এমন আকাঙ্ক্ষা সকলের। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভাজিত লক্ষ্য ও কর্মসূচি নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেকের মনে নানা অসন্তোষও দেখা যায়। এ নিয়ে প্রতিনিয়ত পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের টকশোতে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। বৈষম্যহীন, মানসম্মত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, ন্যায়ভ্রষ্টতার আধিপত্য, অঙ্গীকার রক্ষায় সদিচ্ছার অভাব, প্রকল্পসমূহের ধারাবাহিকতা না থাকার কারণে স্বাধীনতার এত বছর পরও এদেশে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে একীভূত ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে কাজ করা দরকার। এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

একই ধারার প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন : বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় কাজ করছে তার মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নব্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সাবেক নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), হাই স্কুল সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডার-গার্টেন, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনন্দ স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অন্যতম। এছাড়াও আছে মক্তব, কওমি শিক্ষা, গ্রামভিত্তিক শিক্ষা ইত্যাদি। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমও ভিন্ন ভিন্ন; পাশাপাশি শিক্ষকদের যোগ্যতা ও মান এক রকম নয়। বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সারাদেশে অচিরেই অভিন্ন কারিকুলামে একই ধারার প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা জরুরি। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবায়ন করা উচিত।

অবকাঠামোগত অবস্থার উন্নয়ন : বিগত দশকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন হলেও এখনও গ্রামের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠমোগত অবস্থা ভালো নয়। অনেক বিদ্যালয়ে নেই পাকা দালান, নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র (চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ), নেই শৌচাগারের সুব্যবস্থা, নেই শিশুদের উপযোগী খেলার মাঠ, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ছাড়া মানসম্মত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো আধুনিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও শিক্ষাবান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে চাহিদার সঠিকতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিদ্যালয় নির্বাচন করতে হবে। একটি দুই শিফটের বিদ্যালয়ে কমপক্ষে পাঁচটি কক্ষ থাকা আবশ্যক যার একটিতে অফিস কক্ষ থাকবে। দুটি কক্ষ প্রাক-প্রাথমিক ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত থাকবে। বাকি দুটি কক্ষে প্রথম শিফটে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শিফটে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী আদর্শ অনুপাত : আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রতি শ্রেণীতে শিশুসংখ্যা গড়ে ৫০ থেকে ৬০ জন বা এরও বেশি। কোনো কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণীতেই শিশুসংখ্যা ৭০/৮০ জনের বেশি। আবার অনেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে ১০০+ শিক্ষার্থীও পাওয়া যায়। শ্রেণীতে শিশুসংখ্যা ৪০ জনের অধিক হলেই আমরা ঐ ধরনের শ্রেণীকে অধিক শিশুসংবলিত শ্রেণী বলে থাকি। একজন শিক্ষকের পক্ষে অধিকসংখ্যক শিশু সংবলিত শ্রেণীতে মানসম্মত শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টকর। তাই বিদ্যালয়গুলোতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ ও সমন্বয় করে আদর্শ অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী নিয়ে আসা প্রয়োজন।

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া : আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হলো যারা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতা করতে আসেন তারা কোনোরকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই শিক্ষকতা করতে আসেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে (স্বাস্থ্য/কৃষি/প্রাণিসম্পদ/যে কোনো বিভাগে টেকনিকেল পেশায়) চাকরি করতে হলে তাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা ডিপ্লোমাধারী হতে হয়। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষকতা একটি জটিল পেশা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান বা কোনোরকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার মূল ভিত্তি– এ সময়টা খুবই স্পর্শকাতর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অবশ্যই শিশু-মনোবিজ্ঞান ও পেড্যাগোগি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি। শিক্ষাব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ স্তরে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ও অপ্রস্তুত শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে পরেছেন কিনা খতিয়ে দেখতে হবে। ডিপিএড/সিইনএড প্রশিক্ষণ উন্মুক্ত করে প্রাথমিক স্তরে ডিপিএড/সিইনএড প্রশিক্ষণধারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। এতে সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে এবং বিদ্যালয়গুলোরও শিক্ষক-ভোগান্তি কমবে।

ঝুঁকিপূর্ণ প্রান্তিক/দরিদ্র শিক্ষার্থী এবং ঝরে পড়া : প্রান্তিক, দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী পরিবারের শিক্ষার্থীর একাংশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে (উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং) বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ঠিকই কিন্তু শিক্ষাসেবা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকে না। আর প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতাই এসব ছেলে-মেয়ের একমাত্র অবলম্বন। শিক্ষাকগণের নির্দেশনায় কোনো ঘাটতি থাকলে তা সংশোধনের কোনো সুযোগ অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তাছাড়া পাঠদান আনন্দময় না হলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ঝরে পড়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে এই শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে ভাসমান শিশু, শ্রমজীবী শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, পথশিশু, দরিদ্র পরিবারের শিশুরা সব সময়ই ঝরে পড়ার আশঙ্কার মধ্যে থাকে। এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অসহায় সন্তানদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় এনে ঝরেপড়া রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অভিভাবকদের উদগ্রীবতা : শহরের দুই-চারটি নামিদামি সরকারি/বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য অভিভাবকেরা উদগ্রীব হয়ে থাকেন। এই স্কুলগুলোতে তাদের সন্তানকে ভর্তির জন্য রীতিমতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আর এই স্কুলগুলো সরকারি নির্দেশ অমান্য করে প্রচুর টিউশন ফি হাতিয়ে নিচ্ছে। যার ফলে অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অভিভাবকেরা অতিরিক্ত ও অন্যায্য আর্থিক চাপের শিকার হয়ে মানসিক কষ্টে আছেন এবং উদ্যম হারিয়ে ফেলছেন। এছাড়া এসব স্কুলগুলোর ভর্তি-বাণিজ্যের অভিযোগও নেহাত কম নয়। শিশুর সুস্থ মানসিকতা তৈরি, শিশুকে ন্যায়পরায়ণ ও অকপট হতে পরিবার-অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা তৈরি করা জরুরি। নতুবা শিশুর মধ্যে মনোজাগতিক শূন্যতা দেখা দেবে– যা শিশুকে বিপথগামী করতে পারে। অভিভাবকের দরিদ্রতা, অসচেতনতা, অতিমাত্রায় সচেতনতা, অসংযমী উচ্চাশা, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব অনেক সময় শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় : দেশের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় পাশের হার বাড়লেও শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে বিকশিত হচ্ছে কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট অর্জন করছে ঠিকই কিন্তু নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের জায়গাটা ফাঁকাই থেকে যাচ্ছে। এ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে দেশ ও জাতি গভীর সামাজিক সংকটের মুখে পতিত হতে পারে। শিশুদের মাঝে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানেই তারা পরিবার থেকে প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবিক গুণাবলীর শিক্ষা পেয়ে থাকে। শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবক সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ও সৃজনশীল চিন্তার প্রসার ঘটাতে পারে। শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বা স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা বাধাগ্রস্ত হয় এমন কিছু করা যাবে না। জীবনের শুরুতে চিন্তা-চেতনার স্বাভাবিক ধারা বাধাগ্রস্ত হলে তা থেকে বৈপরীত্য জন্ম নেয়। এ ধরনের পন্থা কখনো আদর্শিক নয়– সাংঘর্ষিক হয়। মূল্যবোধের চরম সংকট মুহূর্তে দেশের শিক্ষকসমাজকে শ্রেণীকক্ষসহ সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল্যবোধ বিকাশের জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা রাখতে হবে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণেধরা মূল্যবোধকে শিক্ষক সমাজই আবার জাগিয়ে তুলতে পারেন।

প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ : প্রধান শিক্ষক হলেন একটি বিদ্যালয়ের প্রাণ-ভোমরা। বিদ্যালয়ের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তাকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়। প্রধান শিক্ষকের দক্ষতা, আন্তরিকতা, পেশাদারিত্ব ছাড়া বাহির থেকে শত সাপোর্ট দিয়েও একটি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি হলেন সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক সুপারভাইজার। তিনি সকল শিক্ষকের মধ্যে দলীয় চেতনা তৈরি করে বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিখন-শেখানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। বর্তমানে প্রতিটি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়োগ বা পদোন্নতি দিয়ে প্রধান শিক্ষকের সকল শূন্যপদ পূরণ করা জরুরি।

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার : প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির (কনভেনশনাল সিস্টেম) পরিবর্তে প্রায়োগিক ও সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা উচিত। বিদ্যালয়কে ভীতিকর নয়, আনন্দের জায়গায় পরিণত করতে হবে। বিদ্যালয় যেন শিশুদের কাছে স্বপ্নের ঠিকানায় পরিণত হয়। সেখানে যেন শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে লেখাপড়া (Joyful learning) করার সুযোগ পায়। প্রাথমিক শিক্ষায় একাডেমিক পড়াশোনার প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে দেশপ্রেম, নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া। পাশাপাশি জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, সৃজনশীল কাজ, দলগত কাজ, সামাজিক কার্যক্রম (সোশ্যাল একটিভিটি), সহযোগিতামূলক শিক্ষণ (কোলাবোরেশন), দেশপ্রেমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, বাস্তব জীবনভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা, প্রকৃতিকে জানা, সার্বিক বিকাশ সাধন, উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখানো– এগুলোর প্রতি গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক : শিক্ষাক্রম হলো একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের লিখিত দলিল। আর পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়। আমাদের দেশে প্রতিটি শিশুর হাতে শিক্ষা বছরের প্রথম দিনেই নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হয়– এটি একটি মাইলফলক। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মান, তথ্য-বিভ্রান্তি, সংযোজন, বিয়োজন, মুদ্রণত্রুটি– এ ধরনের বিশেষ কিছু বিষয় প্রতি বছরই জনমনে নানা সংশয় সৃষ্টি করে। প্রতি বছর নতুন বই এলেই তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ এসব জায়গায় যোগ্য ও দক্ষ লোকদের বসাতে হবে। শিশুর বয়স, মেধা ও দৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা, গুণগতমান ও বিষয়বস্তুর পরিধি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজানো যেতে পারে। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, সৃজনশীলতা, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, পাশাপাশি উগ্রবাদ ও নৈতিক-মানবিক অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মতো নতুন নতুন বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে শিক্ষাক্রমকে নতুন করে সাজানো প্রয়োজন।

যোগ্যতাভিত্তিক/সৃজনশীল পদ্ধতি : প্রাথমিক শিক্ষাক্রম একটি যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে তা সুনির্দিষ্ট করা আছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য যোগ্যতাভিত্তিক/সৃজনশীল পদ্ধতিতে শ্রেণীপাঠদান, প্রশ্ন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। শিশুর জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে এর বিকল্প নেই। যোগ্যতাভিত্তিক পদ্ধতি প্রবর্তনের মূল লক্ষ্যই হলো শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক পরিপক্বতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের অতি সংক্ষেপিত বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার বিষয়ে প্রশ্ন কাঠামো নির্মাণ শিক্ষকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জন পাঠ্যবইয়ের পাঠ্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভর করে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা এবং সে অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয় ও শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলো আয়ত্তের ওপর। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকেরই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম, শিখনক্রম ও প্রশ্নপত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ধারণা নেই। এখন শিক্ষকগণ আরও বেশি গাইডবই নির্ভর হয়ে পড়েছেন। যোগ্যতাভিত্তিক/সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান যথার্থ অর্থে কার্যকর করতে হবে। এজন্য শিক্ষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে।

(আগামীকাল সমাপ্য)